67

তারিখ ..0 2.FEB..1996 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ ...

দৈনিক জনকণ্ঠ

বেশি নম্বর পাবার আশায় ছাত্ররা এখন গ্রামমুখী

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এ মেরুদণ্ডটি সোজা ও শক্ত রাখার জন্য প্রতিটি সরকার সাধারণত দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। এই শিক্ষা কমিশনগুলো কিছু গুণী ও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের সহযোগিতায় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। সরকার তার শিক্ষানীতিকে গণমুখী শিক্ষানীতি বলে অভিহিত করে এবং বলে এ নীতিতে দেশের এক শ' ভাগ লোক শিক্ষিত হবে। অর্থাৎ শিক্ষার হার এক শ' ভাগে উন্নীত হবে। কিন্তু আমরা দেখছি শিক্ষার হার আদৌ বৃদ্ধি পায়নি বরং জাতি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। যেহেতু শিক্ষার হার প্রকৃতপক্ষে বাড়ছে না, সেহেতু এ ব্যর্থতার পিছনে নিশ্চয়ই কোন না কোন কারণ আছে। আমার মনে হয় এ ব্যর্থতার জন্য ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি একটি মূল কারণ। দ্বিতীয়ত ধরা যায় নীতি বাস্তবায়নে সরকারের স্বচ্ছ আন্তরিকতার অভাব। সরকারের স্বচ্ছ আন্তরিকতার অভাবের কথা আমি বলতে চাই না। আমি শুধু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি নিয়ে দু'-একটি কথা বলতে চাই।

আগেই বলেছি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের কিছু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ব্যক্তি জড়িত ছিলেন। তাঁদের দ্বারা প্রণীত প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি বা নীতি, যা টিক পদ্ধতি নামে পরিচিত, তা কিন্তু শুধু এসএসসি পর্যায়ে চালু করা হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও প্রথম

মোঃ নিজাম উদ্দিন

বিভাগে পাস করা কষ্টকর ছিল না। এ প্রথম বিভাগ পাওয়া বা স্টার নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীরা কলেজে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে প্রবেশ করে। এখানে টিক পদ্ধতি চালু নেই। এখানে এসে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিরাট বিরাট বই দেখে ভয় পায়। এ ভয়ের কারণে তারা সাজেশন খোঁজে। নির্দিষ্ট ক'টি প্রশ্ন মুখস্থ করে যেন পাস করা যায় সেজন্য প্রাইভেট পড়ার এবং কোচিং করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই যে অসহায়বোধ সৃষ্টি হয়, তার জন্য ঐ টিক পদ্ধতি দায়ী। এ পদ্ধতিতে পাসের হার বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার হার এবং মান বাড়েনি। বাংলাদেশ স্টারে সয়লাব হলেও জাতির কোন লাভ হয়নি। স্টার নম্বর পেয়েও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা নিতে পারেনি, যখন ভর্তি পরীক্ষা চালু ছিল তখন কেউ কেউ ভর্তি পরীক্ষায় পাসও করতে পারেনি।

এরপর নতুন করে এলো ভর্তি পদ্ধতি। ঢাকাকেন্দ্রিক কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষকে নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিল এখন হতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এই নীতি অনুসারে এবার কলেজগুলোতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। বিভিন্ন মহল হতে এ নিয়মকে স্বাগত জানানো হয়। নতুন পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করায় অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যা, যেমন রাজনৈতিক চাপ, ছাত্রনেতাদের দলগত কোটা ইত্যাদির হাত হতে কলেজ কর্তৃপক্ষ বেঁচে যায়। কলেজ প্রশাসন স্বস্তি বোধ করলেও ভর্তির এ পদ্ধতি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করছে এবং করবে। আপনারা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, ইতোমধ্যে ব্যাপকহারে টিসি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের, বিশেষ করে বেসরকারী কলেজগুলোর দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বড় বড় শহরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠগুলোতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির মনোনয়ন পাওয়ার পরও অনেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তারা গ্রামের বেসরকারী কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায়, এর পিছনে অতি সহজে অধিক নম্বর পাবার কারণটি কাজ করছে। বেসরকারী কলেজের সম্মানিত অধ্যাপকগণের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কি বলতে চাই তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন এবং বাস্তবতাকে মেনে নিন। আমি বলছি না যে আপনারা অধিক নম্বর পাবার সুযোগ করে দেন বা দেবেন। কিন্তু একটা বিষয় ভেবে দেখার জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। সেটা হলো গ্রেটার রংপুর জেলার অনেক ছাত্রছাত্রী কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের নম্বরের ক্রমানুসারে ভর্তির মনোনয়ন পেয়েও ভর্তি হয়নি। এটা এমন একটি কলেজ, যেখানে ভর্তি হবার সুযোগ পাওয়া মানে জীবন ধন্য হওয়া। অথচ ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ভর্তি না হয়ে থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বেসরকারী কলেজে ভর্তি হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। এর পিছনে খারাপ উদ্দেশ্য আছে বলে ধরে নেয়া যায়। ছাত্রছাত্রীদের গ্রামমুখী হবার প্রবণতা দেখে মনে হয় দেশের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেবার স্ট্যান্ডার্ড সমান নয়। আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, প্রশাসনের কঠোরতা, দুর্বলতা, রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর স্ট্যান্ডার্ড নির্ভর করে। দেশের বিভিন্ন বোর্ডের বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড ভিন্ন হতে বাধ্য। পরীক্ষার স্ট্যান্ডার্ড যদি সর্বত্র সমান না হয় তবে নম্বরের ভিত্তিতে উঁচু শ্রেণীতে ভর্তির বিষয়টি ভেবে দেখার মতো। আইন করে টিসি দেয়া বন্ধ করা গেলেও পরীক্ষা গ্রহণের স্ট্যান্ডার্ড সর্বত্র সমান রাখা সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় যতদিন শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে সুনির্দিষ্ট একটি ছাঁচে ফেলা যাবে না, অথবা যতদিন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড আনা সম্ভব হবে না। জাতীয়করণের সাথে সাথে হয়ত পরীক্ষা গ্রহণের স্ট্যান্ডার্ড একই রকম হবে না, তবে আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট ফর্মুলায় চলে আসবে।

হয়ত কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্ট করার সাথে শিক্ষা জাতীয়করণের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে নেয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। অধিক ছাত্রছাত্রী থাকলে প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি বাড়ে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলছি, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় পাস করে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী অধিক হারে ভর্তি হয়। ইদানীং গ্রামগঞ্জে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কলেজ গড়ে উঠছে এবং কিছু উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি কলেজে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। এ ধরনের কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো হতে পাসের স্ট্যান্ডার্ড আপনারা আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, দেশের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় সরকারী কলেজ কেন্দ্র হতে পাসের স্ট্যান্ডার্ড এক রকম হওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কিছুটা হলেও স্থানীয় মাসলম্যান ও কমিটির সদস্যদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। কোন কোন কলেজে কোন কোন পরীক্ষা কক্ষ তাদের প্রভাবে পরিচালিত হয় বলে শোনা যায়। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণত এমনটি হয় না। তাহলে, দেখা গেল সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পরীক্ষা গ্রহণের স্ট্যান্ডার্ড সমান নয়। এজন্যই শিক্ষা জাতীয়করণ করা বাঞ্ছনীয়।

সরকার ইচ্ছা করলে বর্তমান অবস্থায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী এ কাজটি করতে পারে। প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হতে বেরিয়ে আসতে পারলে সরকারের পক্ষে এ কাজটি করা সম্ভব। কাজটি যত জটিল ও কঠিন হোক না কেন, এটা করতে না পারলে সরকার কখনই শিক্ষার হার বাড়াতে পারবে না। তাই বলছি দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটিমাত্র ফর্মুলায় ফেলে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা নেয়া হলে এসব পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তির মাপকাঠি হিসাবে ধরতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। পরীক্ষা গ্রহণের স্ট্যান্ডার্ড সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে অনেকের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ভর্তির এ নতুন পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে বোধ হয় চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। কেননা ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু রাখার কথা ঘোষণা দিয়েছে। তাহলে এ পদ্ধতিকে সর্বত্র চালু একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায় না।

পরিশেষে বলতে চাই, শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই স্বচ্ছ আন্তরিক হতে হবে। অন্যথায় এধরনের হযবরল পদ্ধতিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।